এই সময়

* কথাসরিৎ *

শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা।
— মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কর্ম খালি

বিগত দশ বছরে ইউ পি এ সরকারের শাসন এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকেছে। এই দ্বন্দ্ব অর্থনীতির দু'টি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। যে কোনও সরকারেরই সব থেকে বড়ো দায়িত্ব দেশের সর্ব শ্রেণির মানুষের মধ্যে সার্বিক উন্নয়ন সাধন। প্রশ্ন হল, কী ভাবে এটা সম্ভব? এই প্রশ্ন ঘিরে তাত্ত্বিক অর্থনীতি সারা বিশ্বজুড়ে চিরকালই বিতর্কের বিষয়। অর্থনীতিবিদদের এক দল মনে করেন, সরকারি ভর্তুকির মাধ্যমে দুর্বলতর শ্রেণির মানুষকে বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতা থেকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়াটাই সরকারের প্রধান কর্তব্য। অন্যদের ধারণা মুক্তবাজার অর্থনীতির মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে আর্থিক বৃদ্ধির সুযোগ আরও পরিব্যাপ্ত করলেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু জনসাধারণ যাঁদের হাতে নিজেদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তাঁরা যদি এই দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান থেকে একটি সুস্পষ্ট নীতি নিতে ব্যর্থ হন তা হলে সমস্যা জটিলতর হতে বাধ্য।

দুর্ভাগ্যবশত ইউ পি এ শাসনকালে এই দোদুল্যমানতাই পরিলক্ষিত হয়েছে। ভারতের নয়া অর্থনীতির অন্যতম রূপকার মনমোহন সিং এই সরকারের নেতৃত্বে থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় বিশেষত দ্বিতীয় ইউ পি এ-র শাসনকালে তাঁকে আর্থিক বৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করার নীতি থেকে সরে এসে ভর্তুকি ভিত্তিক অর্থনীতির উপর বেশি আস্থা রাখতে হয়েছে। অথচ এই ইউ পি এ সরকারেরই শেষ অর্থমন্ত্রী সম্প্রতি সঠিক ভাবে বলেছেন, অন্ধের যষ্টির মত ভর্তুকির সাহায্যের পরিবর্তে আর্থিক বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে দেশের মানুষের অনেক বেশি উপকার হবে। প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে উন্নয়ন সাধিত হতে পারে তা ব্যক্তিগত আর্থিক প্রগতি নির্ভর। অর্থাৎ এর ফলে দেশের নাগরিকদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা রাষ্ট্রের সাহায্যের মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেদের স্বার্থেই অর্থনীতির চাকাটিকে সচল রাখার উদ্যোগ নেন। সরকারের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন তা যদি আর্থিক বৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা হলে শেষ পর্যন্ত সেই চাকাটি শ্লথ থেকে শ্লথতর হতে হতে সেই চাকাটিই স্তব্ধ হয়ে যায়। এ দেশের শ্রম আইন এর একটি বড় উদাহরণ। উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানো। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে এই আইন বৃহৎ শিল্পের পক্ষে মোটেই আদর্শ নয়। শিল্প না থাকলে যে শ্রমিকরাই থাকবেন না ইউ পি এ সরকার এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হওয়ার ফলেই ২০০৫ থেকে ২০১০-এর মধ্যে দেশে মোট শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। যে দলই ক্ষমতায় আসুক কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের এই দোদুল্যমানতা কাটিয়ে উঠে রাজনীতির ফাঁদে অর্থনীতির বাস্তবকে বন্দি না রেখে দেশকে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় সামিল হওয়ার যোগ্য করে তোলাই হওয়া উচিত পরবর্তী সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

গোড়ায় গলদ

মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স-এর এম এইচ – ৩৭০ বিমানের হঠাৎ করে নিখোঁজ হওয়াকে কেন্দ্র করে যে রহস্য বিগত বেশ কিছু দিন ধরেই সবাইকে ধন্দে ফেলেছিল, তার খানিক অবসান হল বলা যায় হয়তো। স্পষ্ট ভাবে ধ্বংসাবশেষ হাতে না এলেও, ভারতীয় মহাসাগরের কোনও এক স্থানে ভাসমান কিছু বস্তু নজরে এসেছে, যা অনেকের মতে, ওই বিমানেরই অংশ। মালয়েশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে এই এত দিনের অতন্দ্র খোঁজ আপাতত শেষ। ২৬টি দেশ যে ভাবে এই খোঁজে সামিল করেছিল তাদের বায়ুসেনা, এমনকী নৌবাবিনীকেও, যে ভাবে সমস্ত কিছু শিকেয় তুলে, শুধু মাত্র এ কাজেই লেগে গিয়েছিল তারা, সেই সবেরও ইতি। অবশ্যই দুর্ঘটনাগ্রস্ত কারও পাশে সবারই দাঁড়ানও উচিত, কর্তব্যও বটে, কিন্তু যদি দেখা যায় এ দুর্ঘটনা এড়ানো না গেলেও, মাত্র দশ ডলার খরচে এই প্রায়-অনন্ত খোঁজের মেয়াদ অনেকটাই কমানো যেত, তখন কোথাও এক রকম খটকা লাগে বটে। এই মস্ত প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। দেখা গিয়েছে যে, মালয়েশিয়ার পরিবহণমন্ত্রক যদি ফ্লাইট পিছু দশ ডলার খরচ করে, 'সুইফ্‌ট' নামক এক প্রযুক্তির ব্যবহার করত, তা হলেই অনেক কম সময় ব্যয় করেই, বিমানের গতি, দিক, উচ্চতা ইত্যাদির বিশদ তথ্য পাওয়া যেত। বলাই বাহুল্য, সে ক্ষেত্রে এতগুলো দেশের সময়, অর্থ, শক্তি সব কিছুই অনেকাংশে বাঁচানো যেত। সেই বিমানে থাকা যাত্রী ও বিমানকর্মীদের আতঙ্কে থাকা পরিবারবর্গকেও অবশ্যই খানিক রেহাই দেওয়া যেত এই অকল্পনীয় রহস্যভাব থেকেও। পরিকাঠামোগত দিকে সামান্য সাশ্রয়ের এই প্রবণতাই শেষ ডেকে আনল।

কিন্তু নিছক পরিকাঠামো নিয়ে আর কে-ই বা ভাবিত? পাঁকে পড়েছে বলে আজ মালয়েশিয়ার সরকারের দিকে আঙুল উঠছে, কিন্তু এহেন প্রবণতা কি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়? শুকনো কাঠ-খড় সাজিয়ে তো আর বাহবা মেলে না। মিলবেই বা কেন? এ তো সবাই করে, নতুন কী? আর মেলে না বলেই, কেউ সে দিকে আলাদা করে মন দেয় না। সবার লক্ষ্য, কী করে ওই কোনও ক্রমে দাঁড় করানো বুনিয়াদি কাঠামোয় রং লাগানো যায়। সাজুগুজু করিয়ে ধুম লাগানো যায় অন্য লাখো চোখে। তাতেই তো অশেষ তালিয়াঁ, অন্তে ইতিহাসের পাতা। এ তো স্থায়ী কালিতে লেখা নিয়মও বটে। অতএব সহজেই ভুলে যাওয়া যায়, যে পরিকাঠামোর দিকে সর্বপ্রথম নজর দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং তা প্রয়োজন সর্বাধিক মাত্রায়। পরিকাঠামোগত দিক থেকে যদি খামতি থেকে যায়, অর্থাৎ ভিতটিই যদি নড়বড়ে থাকে, তবে, উপর মহলে যতই পালিশ দেওয়া যাক, নির্মাণ যুৎসই হবে না। হলেও, তা হবে ক্ষণস্থায়ী। নিঃসন্দেহে আদিম বাণী, কিন্তু পুরনো চাল যে এ ক্ষেত্রে ভাতে বাড়ছে না, তা তো বাস্তবই দেখাচ্ছে। ফলে, মনে করানো প্রয়োজন, সমস্ত রকম পরিকাঠামোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া, তাকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যতটা সম্ভব জমাট করাই প্রথম কাজ। কারণ আপনি বাঁচলেই তো পরের নাম।

* অসংখ্যা *

২০২০০০০০০

(কুড়ি কোটি কুড়ি লক্ষ) – বিশ্বে ১৫ থেকে ২৫ বর্ষীয়দের মধ্যে বেকারদের সংখ্যা। আই এল ও-র সর্বশেষ হিসেব।

* দিনকে দিন *

২৬ মার্চ

১৮৯৩: চিত্রপরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডিজি) জন্মগ্রহণ করেন।
১৯০২: ব্রিটিশ আইন পরিষদে প্রথম আলোচনায় যোগদান করে ভারত।
১৯৭১: বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে।
১৯৮৩: বিপ্লবী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন।

প্রাইজ ক্যাচ, পল্টুদা, জগাই-মাধাই জার্সি বদল কিংবা শাক ও মাছের গল্প

অমিত্রাক্ষর

সুমন চট্টোপাধ্যায়

ব্রাত্য বসু সুদক্ষ নট ও নাট্যকার এ কথা তাঁর শত্রু-শিবিরও এক বাক্যে স্বীকার করে থাকে। কিন্তু পল্টুদা'র ভূমিকাতেও সে যে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, ভাবতে পারিনি।

সত্তর কিংবা আশির দশকে কলকাতার ময়দানে ঘোরাফেরা করেছেন অথচ পল্টুদা'র নাম শোনেননি, হতে পারে না। এখন প্রয়াত এই ভদ্রলোকের পুরো নাম পল্টু দাস। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এই প্রাক্তন সচিবের কাছে ময়দানের তাঁবুটা ছিল কর্মস্থান, ধর্মস্থান এবং তীর্থস্থান। নতুন বছরে দল-বদলের পর্ব শুরু হওয়ার আগে পল্টুদা নিজের ফর্মে বাজারে নামতেন, প্রতিপক্ষের ভালো প্লেয়ারদের ছলে-বলে কৌশলে তুলে আনার চেষ্টা করতেন লাল-হলুদ শিবিরে। তাঁর সেই শিকার ছিল ঘনান্ধকার অরণ্যে চতুষ্পদ হিংস্র জন্তুর মতো। কাকে তিনি তাক করেছেন আগে থেকে কেউ তা ঘুণাক্ষরে জানতে পারত না। শিকারের কাছে পৌঁছে যাওয়া এবং তাকে বধ করার কৌশলগুলি ছিল পল্টুদা'র আইএসও ছাপ মারা। এ সব নিয়ে ময়দানে কত যে গালগল্প আছে তার ইয়ত্তা নেই। অবশ্য তখনও গড়ের মাঠের একটা অন্য রোমাঞ্চ ছিল, দল-বদল ছিল ফি-বছরের অন্যতম চমকপ্রদ ঘটনা। তখনও কলকাতার ফুটবল 'কর্পোরেটাইজেশন'-এর পথে হাঁটেনি, ক্লাবগুলোর চেহারা আফ্রিকান হয়ে ওঠেনি, ঘটি-বাঙালের সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি ছিল গোটা রাজ্যটাকে বিশুদ্ধ, অনাবিল, অরাজনৈতিক আনন্দে মাতোয়ারা করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। তখন ক্লাব কর্তা বলতে বোঝাত হয় জ্যোতিষ গুহ, নয়তো ধীরেন দে, পরের দিকে পল্টু দাস আর গজু বসু। বিজয় মালিয়া তখন অনেক দূর আকাশের তারা।

বিপক্ষ শিবিরের গৌতম-প্রসূনকে তুলে নিয়ে ব্রাত্য বসু এই সে দিন নিজের নামটিকে এক ধাক্কায় পল্টুদা'র সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করে ফেলেছেন। এর জন্য নেত্রীর কাছ থেকে তিনি কতটা বাহবা পেয়েছেন বলতে পারব না, তবে প্রতিপক্ষ শিবিরের অনেকেই এমন নাটকীয় দল-বদলটি হঠাৎ সম্ভব করে তুলতে পারার কারণে শিক্ষামন্ত্রীকে হয় প্রকাশ্যে নয় আড়ালে আবডালে কুর্নিশ জানাচ্ছেন। এক কংগ্রেস নেতা তো সরাসরি ব্রাত্যকে ফোন করেই বলে দিয়েছেন, 'মান লিয়া গুরু! এই সে দিন যারা তোমার বাপ-বাপান্ত করছিল আজ তাদেরই তুমি বাধ্য করেছ নিজের থুতু নিজেই চাটতে।' বিড়ম্বিত শিক্ষামন্ত্রীর তখন ধরণী দ্বিধা হও অবস্থা।

কার্ড হোল্ডিং সদস্য না হলেও অরিন্দম শীল ও সুবোধ সরকার, দু'জনেই এই সে দিন পর্যন্ত আনখশির সিপিএম ছিলেন। সিঙ্গুর থেকে কামদুনি, গত কয়েক বছরে তৃণমূল বিরোধী প্রচারের তাঁরা ছিলেন দুই প্রধান ও পরিচিত মুখ। রাস্তার মিছিলে, সভার মঞ্চে, টেলিভিশনের স্টুডিওয়। প্রতিপক্ষের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময়ের সময় তাঁরা প্রায়শই সংযম হারিয়েছেন, যা মুখে আসে তাই বলে শালীনতার সীমাও লঙ্ঘন করেছেন অবিরত। তাঁদের দেখে, কথা-বার্তা শুনে মনে হত আলিমুদ্দিনে সিপিএমের কার্যালয়টি যেন এঁদের ভ্যাটিকান। ফলে জোড়া-ফুলের ঘরে এঁরা যে 'প্রাইজ ক্যাচ' তাতে আর সন্দেহ কি! চুনোপুঁটি বিদ্বজ্জন নয়, সাক্ষাৎ রুই-কাতলা। উরু-কাতু-মদনা নন, দামী 'একজিবিট'।

ব্রাত্যর পক্ষে কাজটা কঠিন ছিল ধরেই নেওয়া যায়। বামপন্থী আদর্শে একনিষ্ঠ কাউকে বিশ্বাস বা অভ্যাসের কক্ষচ্যুত করা চাট্টিখানি কথা নয়। বিশেষ করে যখন প্যাঁদানির না হলেও ব্যাপক প্যাঁক খাওয়ার ভয় থাকে। তা ছাড়া পরিবর্তনের ঝড়ে বক মরার মতো করে যাঁরা বাম শিবির ছেড়েছেন তাঁদের কথা এক, প্রতিপক্ষ সরকারের মেয়াদের তিন বছরের মাথায় দল ছাড়া আর এক। রাজনীতির লোকেরা দল ছাড়েন ভয়ে, ভক্তিতে অথবা উচ্ছিষ্টের অংশবিশেষ পাওয়ার আশায়। অরিন্দম-সুবোধের সে দায় নেই। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস নেই, চাকরির প্রয়োজন নেই, পার্থিব অন্য কোনও প্রাপ্তির হাতছানি আছে বলেও মনে হয় না। সে দিক থেকে দেখতে গেলে এটা ব্রাত্যর 'ক্যু'।

অনেক টাকা ঝুলিতে ভরে প্রতি দিন একই রাস্তা দিয়ে ব্যাঙ্কে গেলে এক দিন ডাকাতি হতেই পারে। সে জন্যই কোনও এক ধর্ম-প্রচারক জোর গলায় বলেছিলেন, 'কনসিস্‌টেন্সি ইজ দ্য ভারচু অব দ্য ফুল।' সুবোধ ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, বাংলা ভাষার কবি। ইচ্ছে করলে তিনি অস্কার ওয়াইল্ড, অলডাস হাক্সলি অথবা র‍্যাল্ফ এমারসনকে আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যবহার করতে পারেন। একমাত্র কল্পনা-বিবর্জিত মানুষের পক্ষেই 'কনসিস্‌টেন্ট' থাকা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন ওয়াইল্ড। হাক্সলির সুস্পষ্ট মত ছিল, 'কনসিস্‌টেন্সি' জাগতিক সব নিয়ম এমনকী জীবনের মূলমন্ত্রেরও বিরোধী। তাঁর মতে 'দ্য ওনলি কম্পলিটলি কনসিস্‌টেন্ট পিপল আর ডেড।' আর এমারসনের মতে, 'এ ফুলিশ কনসিসটেন্সি ইজ দ্য হব্‌গব্‌লিন অব লিটল মাইন্ডস।'' কল্পনাহীন, ক্ষুদ্র মনুষ্যে ভরে গিয়েছে হেরো আলিমুদ্দিন। সেখানে কি আর কবি-শিল্পীর জায়গা আছে?

ভালো করে হোম-ওয়ার্ক করে টিভি ক্যামেরার মুখোমুখি হলে আরও জুতসই জবাব দিতে পারতেন সিপিএম-ত্যাগী এই জগাই-মাধাই। তাঁদের জ্ঞানচক্ষু ঠিকঠাক উন্মীলিত হয়ে থাকলে তাঁরা দেখতে পেতেন, কবির অমর বাণী, 'মেলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে' অক্ষরে অক্ষরে সম্ভব হয়েছে কেবল পরিবর্তনের জমানায়। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর থেকে এক পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনও ভূখণ্ডে এত 'কমিউনিস্ট' এক সঙ্গে দল ছাড়েননি। তা তিনি গাঢ় লাল, ফিকে লাল, বেগনে-লাল যে কোনও কিছুই হতে পারেন। কোচবিহার থেকে গঙ্গাসাগর যেখানেই যান দেখবেন গতকালই যাঁরা লাল ঝান্ডা নিয়ে মিটিং-মিছিল করেছেন তাঁরা এখন একটু জিরোচ্ছেন জোড়া ফুলের বনে। তিনি মামুলি ক্যাডার হতে পারেন, পঞ্চায়েত-পঞ্চায়েত সমিতি-জেলা পরিষদ সদস্য হতে পারেন, কাউন্সিলর হতে পারেন আবার বর্তমান অথবা প্রাক্তন বিধায়ক অথবা সাংসদ অথবা মন্ত্রীও হতে পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বারবার বলে থাকেন তিনি সিপিএমকে অপছন্দ করেন কিন্তু বামপন্থাকে করেন না। বস্তুত বামপন্থীদের এত কদর ৩৪ বছরের বাম জমানাতেও দেখা গিয়েছে কি না সন্দেহ! মুকুল রায়ের জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্রই তো হল 'সবারে করি আহ্বান।'

নানা জাতের, নানা গোত্রের বামপন্থীদের নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ওঠা-বসা কোনও নতুন ব্যাপার নয়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বামফ্রন্ট বিরোধী রামধনু মঞ্চে পিডিএস, এসইউসিআই, নকশাল, মোহভ্রষ্ট বামমনোভাবাপন্ন কলাকুশলী, কে না শরিক ছিলেন? পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন ছিটকে গিয়েছেন তেমনই সিপিএম সহ বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি থেকে পলায়নের ঢল নেমেছে তৃণমূলের উদ্বাস্তু শিবিরে। রাজ্যসভার ভোটে তিন জন বাম বিধায়ক তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। তার অনেক আগে থেকেই পঞ্চায়েত স্তরে জয়ী হওয়া বাম প্রার্থীরা প্রায় রোজ কেউ না কেউ তৃণমূলে চলে আসছেন। জার্সি বদলটাই হাল আমলের বাংলার সবচেয়ে চালু ফ্যাশন। ফ্লেভার অব বেঙ্গল পলিটিকস। কেন এমনটা হচ্ছে, বাম দলগুলিতে নীতি ও আদর্শের বুনিয়াদটা কেন এ ভাবে উইয়ের ঢিবির মতো ভেঙে পড়ছে তা নিয়ে তাত্ত্বিক বিতর্ক হতে পারে, হয়তো হচ্ছেও। কিন্তু এর ফলে বাম-ডানের পরিচিত ভেদরেখাটা যে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ আছে কি?

এ বারের নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকার দিকে এক বার চোখ রাখা যাক। যে তিন বিধায়ক আরএসপি আর ফরোয়ার্ড ব্লক থেকে এসেছেন তাঁদের মধ্যে দু'জন লোকসভায় (আলিপুরদুয়ারে দশরথ তিরকে আর বর্ধমান পূর্বে সুনীল মন্ডল) এবং এক জন বিধানসভায় প্রার্থী হয়েছেন। আসানসোলের প্রার্থী দোলা সেন প্রাক্তন নকশালপন্থী। দার্জিলিংয়ে বাইচুং ভুটিয়া কিংবা বহরমপুরে ইন্দ্রনীল সেন বাম জমানায় বিবিধ সুবিধাভোগী, ওই শিবিরের লোক বলেই বেশি পরিচিত। এদের মধ্যে ইন্দ্রনীলেরই মনে হয় রসবোধ সবচেয়ে বেশি। কেননা, শোনা গেল ঘনিষ্ঠ মহলে বুক চিতিয়ে তিনি বলে বেড়াচ্ছেন, 'আমি হলাম বাংলার রাজনীতির মুস্তাক মহম্মদ। ভারতের হয়ে খেলেছি আবার পাকিস্তানের হয়েও খেলেছি।' পশ্চিমবঙ্গে এখন এই মুস্তাক মহম্মদদেরই ছড়াছড়ি। ভোটের রাজনীতিও পর্যবসিত হয়েছে অন্য আর এক ধরনের আইপিএলে। দর হাঁকিয়ে এমন প্লেয়ার ধর যে এলে টিমের সুবিধে। নীতি, আদর্শ, বিশ্বাস এই সব আইডিয়াগুলি জুরাসিক পার্কের। এখন মাল যেখানে ঢল সেখানেই।

অথচ সুবোধ অথবা অরিন্দম সহজ রাস্তায় না হেঁটে, অনর্থক শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করে কেস খেয়ে গেলেন। এক জন বললেন গভীরতম ব্যক্তিগত শোকের দিন কমিউনিস্ট বন্ধুরা পাশে দাঁড়ায়নি বলে তিনি আর ওদের সঙ্গে সংস্রব রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি। অন্য জন জানালেন, পরিচিতি 'মাকু' হওয়া সত্ত্বেও তৃণমূল জমানায় তিনি স্বাধীন ভাবে কাজ করার যে সুযোগ পেয়েছেন, সরকারের কাছ থেকে যে রকম ঢালাও সহযোগিতা পেয়েছেন তার পর সমর্থন না জানানোটা হত চরম অকৃতজ্ঞতা। সহস্রাব্দের সবচেয়ে রোখো যুক্তি হিসেবে এই দু'টি ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা আমরা মনে রাখব অনেক দিন।

আসলে সরকারের আনকূল্য না পেলে বাঁচতে পারে না 'সুবোধ' কেউ। আর শুধু 'শীল' হয়ে থাকলে, পরিবর্তনের জমানায় লাফরা অনেক। অরিন্দম তাই হয়েছেন 'সংবেদনশীল'।

দল বদলের পরে জোড়া ফুলের তাঁবুতে এসে আত্মপক্ষ সমর্থনটা কী ভাবে করতে হবে, দুই জিগরি দোস্তকে ব্রাত্য সেই ডায়ালগগুলি শিখিয়ে দিলেই তো পারতেন! কোনও রকম রিহার্সাল ছাড়া সোজা মঞ্চে এসে কি অভিনয় করা যায়?

কৌশিক রায়

ভালো করে হোম-ওয়ার্ক করে টিভি ক্যামেরার মুখোমুখি হলে আরও জুতসই জবাব দিতে পারতেন সিপিএম-ত্যাগী এই জগাই-মাধাই। জ্ঞানচক্ষু ঠিকঠাক উন্মীলিত হয়ে থাকলে তাঁরা দেখতে পেতেন, কবির অমর বাণী, 'মেলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে' অক্ষরে অক্ষরে সম্ভব হয়েছে কেবল পরিবর্তনের জমানায়। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর থেকে এক পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনও ভূখণ্ডে এত 'কমিউনিস্ট' এক সঙ্গে দল ছাড়েননি।

* বোধিবৃক্ষ *

'ও জ্ঞান জ্ঞানই নয়'

শ্রীম কথিত কথামৃত

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কি রে, তুই যে একলা— সে আসেনি?'' জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিল, ''সে মশাই আজকাল খুব বেদান্তচর্চায় মন দিয়েছে। তাই বাধ হয় সময় নষ্ট হবে ব'লে আসেনি।''

উহার কিছুদিন পরেই, আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। ঠাকুর বলিলেন, ''কি গো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্তবিচার কর্‌চ? তা বেশ, বেশ। তা বিচার তো খালি এই গো— ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, —না আর কিছু?''

বন্ধু— আজ্ঞা হাঁ, আর কি?

বন্ধু বলেন, বাস্তবিকই ঠাকুর সেদিন ঐ কয়টি কথায় বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার চক্ষু যেন সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিলেন।

ঠাকুর— শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা— আগে শুনলে; তারপর মনন— বিচার ক'রে মনে মনে পাকা করলে; তারপর নিদিধ্যাসন— মিথ্যা বস্তু জগৎকে ত্যাগ ক'রে সদ্বস্তু ব্রহ্মের ধ্যানে মন লাগালে— এই। কিন্তু তা না হয়ে শুনলুম, বুঝলুম কিন্তু যেটা মিথ্যা সেটাকে ছাড়তে চেষ্টা করলুম না— তা হ'লে কি হবে? সেটা হচ্চে সংসারীদের জ্ঞানের মতো; ও রকম জ্ঞানে বস্তুলাভ হয় না। ধারণা চাই, ত্যাগ চাই— তবে হবে। তা না হ'লে, মুখে বল্‌চ বটে, 'কাঁটা নেই, খোঁচা নেই', কিন্তু যেই হাত দিয়েছ অমনি প্যাট্‌ ক'রে কাঁটা ফুটে উহুঃ উহুঃ ক'রে উঠতে হবে, মুখে বল্‌চ 'জগৎ নেই, অসৎ— একমাত্র ব্রহ্মই আছেন' ইত্যাদি, কিন্তু যেই জগতের রূপরসাদি বিষয় সম্মুখে আসা, অমনি সেগুলো সত্যজ্ঞান হয়ে বন্ধনে পড়া। পঞ্চবটীতে এক সাধু এসেছিল। সে লোকজনের সঙ্গে খুব বেদান্ত-টেদান্ত বলে। তারপর এক দিন শুনলুম, একটা মাগীর সঙ্গে নট্‌-ঘট্‌ হয়েছে। তারপর ওদিকে শৌচে গিয়েছি, দেখি সে বসে আছে। বললুম, 'তুমি এত বেদান্ত-টেদান্ত বল, আবার এ সব কি?' সে বললে, 'তাতে কি? আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্চি তাতে দোষ নেই। যখন জগৎটাই তিন কালে মিথ্যা হল, তখন ঐটেই কি সত্য হবে? ওটাও মিথ্যা।' আমি তো শুনে বিরক্ত হয়ে বলি, 'তোর অমন বেদান্তজ্ঞানে আমি ... দি!' ও সব হচ্চে সংসারী, বিষয়ী জ্ঞানীর জ্ঞান। ও জ্ঞান জ্ঞানই নয়।

সংরক্ষণ কোনও বিশল্যকরণী নয়

শুধু রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়াবার লড়াই পিছিয়ে পড়া জনজাতির মূল সমস্যাগুলো দূর করতে পারে না। আত্মপরিচয়ের রাজনীতি প্রসঙ্গে **মইদুল ইসলাম**। শেষ পর্ব

দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল-এর পর থেকেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সর্বত্র 'নিপীড়িতের শৃঙ্খলমুক্তির অগ্রদূত' হিসেবে শ্রমিক শ্রেণিকেই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে কল্পনা করে নেওয়া হয়েছিল। এই গোঁড়া শ্রেণিকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ এবং শ্রমিক শ্রেণির কেন্দ্রীয় ভূমিকা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার পর থেকেই প্রশ্নের মুখে পড়ে। অন্য দিকে, ছয়ের দশক থেকেই উঠে আসে বিভিন্ন অ-শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের প্রশ্ন— লিঙ্গসমতার লড়াই, ভাষাগত জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ এবং বিশেষত ভারতীয় প্রেক্ষিতে, দলিতদের মর্যাদা, আদিবাসীদের অধিকার এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন। সাবেকি মার্কসিয়-লেনিনিয় যুক্তি মেনে বামপন্থীরা এই সব দ্বন্দ্বকে মৌলিক কোনও দ্বন্দ্ব বলে স্বীকার করেনি। এমনকী তারা এ কথাও বলেছে যে এ সবই হল শ্রমিক শ্রেণিকে বিভক্ত করার জন্য শাসক শ্রেণির চক্রান্ত। যেহেতু বামপন্থীদের কাছে একমাত্র শ্রেণিসংগ্রামের ভূমিকাই প্রাথমিক, কাজেই ভারতীয় প্রেক্ষিতে আত্মপরিচয়ের সামাজিক মর্যাদার লড়াইয়ের প্রসঙ্গটি খতিয়ে দেখায় বামপন্থীদের খামতি থেকে গিয়েছে।

স্মর্তব্য, ভারতে এই জাতীয় অ-শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের জন্য এই সামাজিক ফাটলগুলিকে রেখেঢেকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যখনই আত্মপরিচয়ের রাজনীতি প্রকাশের পথ খুঁজে পেল, আমরা দেখতে পেলাম দলিত, আদিবাসী, ওবিসি এবং মুসলিমদের ভিত্তি করে কৌমভিত্তিক আনুগত্যের রাজনীতির উত্থান। আটের দশকের শেষ থেকেই কেন্দ্রে মূলত কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন একদলীয় শাসনের কাঠামো ভাঙতে থাকে। ফলত ভারতীয় রাজনীতিতেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা বিভাজিত হয়। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান ভূমিকা নেয় দলিত-আদিবাসী-মুসলিম রাজনীতি, যা আত্মপরিচয়ের রাজনীতির নিজস্ব ভাষায় নিজেদের অধিকার দাবি করে। যেহেতু কৌমভিত্তিক এই রাজনীতির কাছে বামপন্থীদের মতো কোনও প্রগতিশীল রাজনৈতিক ভাষা ছিল না, কাজেই রাজনীতির চলতি ভাষাই হয়ে ওঠে শাসক শ্রেণি/জাতের বিরুদ্ধে প্রান্তিক বর্গের প্রতিবাদ জানাবার আয়ুধ।

অন্য দিকে, ভারতীয় বামপন্থীরা এই প্রশ্নকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে অনেকটা সময় লাগিয়ে দেন। কাজেই যখন বামপন্থীদের তরফে এই পিছিয়ে পড়া সামাজিক বর্গের সুনির্দিষ্ট সমস্যার কথা বলা হয়, তত দিনে জাতীয় রাজনীতিতে দলিত আন্দোলন এবং আদিবাসীদের ক্ষমতায়নের আন্দোলন যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। এই একই সময়ে কংগ্রেস কিছু প্রতীকী প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে দলিত এবং মুসলিমদের কাছে টানার চেষ্টা করে। কিছু ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক কারণে বামপন্থীরা দলিত এবং পিছিয়ে পড়া জাতের প্রশ্ন উত্থাপন করে, যেমন কেরলে মন্দিরে প্রবেশাধিকার আন্দোলনের সময়ে। কিন্তু ছয়ের দশকে ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ এবং আটের দশকের প্রথম দিকে বি টি রনদিভে শ্রেণি সংগ্রাম এবং জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে যোগসূত্র রচনার তাত্ত্বিক ভাবনা পেশ করলেও, কেবল একুশ শতকের গোড়াতেই বামপন্থীরা প্রথম এই বিষয়ে কিছু দৃশ্যমান উদ্যোগ নেয়। বস্তুত সি পি আই এম-এর অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসের আগে দলিতদের প্রশ্নের দিকে সেই ভাবে কোনও নজর দেওয়া হয়নি। নজর পড়ে তখনই যখন বহুজন সমাজ পার্টি উত্তর ভারতে প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠেছে। ঠিক একই ভাবে অতিসম্প্রতি সময় পর্যন্ত আদিবাসী অধিকারের প্রশ্নটি বামপন্থীদের কাছে উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছে।

অথচ প্রান্তিক সামাজিক বর্গের আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার মৌলিক ক